নারীমুক্তির একশো পঁচিশ বছর

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

শিক্ষার সঙ্গে মুক্তির নিকট সম্পর্ক। শিক্ষা মানে মনের জানালা খোলা, যে-খোলা জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবী তার আলো-হাওয়া নিয়ে হাজির হয়। বদ্ধঘরের সংকীর্ণ দৃষ্টি জানালা দিয়ে বহির্বিশ্বে প্রসারিত হয়। তারপর দৃষ্টি খুললে মানুষ খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ায়, তখন দিগন্তই সীমা। আবার তেমন অবস্থা ঘটলে সে-দিগন্তও অনন্তে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু নারীমুক্তির কথা কেন? পুরুষ কি মুক্ত ছিল? ছিল, আবার ছিল না। অধিকারভোগী পুরুষের চিন্তায় মুক্তি থাকলেও তা ছিল অনধিকারীর মূল্যে, যে মূল্য সে হারাতে রাজি ছিল না। এই অনধিকারী সমাজের বৃহত্তম অংশই ছিল নারীজাতি। তাদের অধিকারী করে তোলার কথা মুক্তমনা কিছু মানুষের আণুবীক্ষণিক সংখ্যাল্পতার জন্যে সমাজে কস্কে পায়নি। ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে এল পাশ্চাত্য শিক্ষার যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান তার বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। সে-শিক্ষার মূল ভোগবাদে প্রোথিত। কিন্তু সেই সময়ে তার খুব প্রয়োজন ছিল। বস্তুত সেই শিক্ষা ভারত তথা বাংলার নবজাগরণের উৎসমুখ হয়ে উঠেছিল। এছাড়া এর ভোগবাদী দর্শন ন্যূনতম ভোগে চিরবঞ্চিতদের মনে ভোগের অধিকারচেতনা জাগিয়েছিল। যুগপরিবর্তনের একটা শুরু দরকার। এই শুরুর সন্ধিক্ষণে জগৎ সম্বন্ধে আপাত উদাসীনতা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন তাঁর অতুল অধ্যাত্মশক্তি নিয়ে। তাঁর আধ্যাত্মিক অবস্থানে জগৎ যেন ছায়াময়, অশরীরী। তবু বৈচিত্র্যময় এই জগতে সর্বত্র একই চেতনার অনুভবে নিমজ্জিত থেকেও অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জনসমাজকে তুলে আনতে তাঁর কী আকুল আগ্রহ! কিন্তু তাঁর গভীর ভাবময় শরীর সে-কর্মের রূপ দিতে উপযুক্ত ছিল না। সেই আগ্রহকে সাকার রূপ দিতে তিনি নিয়ে এলেন সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম ঋষি নরেন্দ্রকে।

নরেন্দ্র বা এ-জগতে মনুষ্যোচিত জীবনযাপনের দিগ্‌দর্শক স্বামী বিবেকানন্দ সে-আকুলতার রূপকার; শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব ও তার প্রয়োগের যোগসূত্র। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বৃহত্তম দোষ ছিল তার উদ্দেশ্য। অবশ্য বিদেশি শাসক শাসিতকে বশে রাখার জন্য তাদের সুবিধামতো শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবে সেটাই স্বাভাবিক। এর এক অংশ যুক্তি ও বিজ্ঞানমুখী, অপর অংশ ভারতীয় সংস্কৃতি যে কতটা দুর্বল ও অপরিণত তা দেখানো। নাগরিক শিক্ষিত সমাজ যুক্তিবাদী হল তাদের সংস্কৃতির ওপর অশ্রদ্ধার মূল্যে। এর বিপদ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক

অনেকেই বুঝেছিলেন তাই নানা পথের সন্ধানে নানা সমাজ গড়ে উঠেছিল। প্রার্থনাসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ—প্রত্যেকেই প্রাচীন ব্যবস্থা আর নতুনের সম্মিলনে এক নতুন উজ্জীবনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যথার্থ কারণটি ধরতে না পারায় এগুলি তাৎক্ষণিক কিছু বদল আনতে সমর্থ হলেও সার্থকতা লাভ করেনি। স্বামীজীর ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টির কাছে এর সমাধান স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়েছিল। যেকোনও আচার-আচরণের পেছনে কোনও সামাজিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য থাকে, যা আপাত-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু তা সবসময়েই জাতীয় লক্ষ্যের অভিমুখী, আর ভারতের ক্ষেত্রে তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বন্ধনমুক্তির প্রয়াস বা মুক্তি। প্রশ্ন ও যুক্তির কাজ সত্য উদ্‌ঘাটন করা, কোনও বিষয়কে বুঝে উঠতে না পারলে তাকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে উড়িয়ে দেওয়া নয়। স্বামীজীর মতে নতুন ভাল জিনিস গ্রহণ করতে হবে তাকে আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তাদের উত্তম আহার্যকে গ্রহণ করব পাত পেড়ে-হাত দিয়ে—কাঁটা-চামচ ব্যবহার করে নয়। আধুনিক শিক্ষা নেব গুরুকুলের ভাবে। যেখানে তত্ত্ব জীবনে প্রযুক্ত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি জোগাবে, আত্মশক্তিতে ভরপুর চরিত্র গঠিত হবে। তাই শিক্ষার এক চিরন্তন সংজ্ঞা দিলেন স্বামীজী—অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধন।

কিন্তু এই কাজটি তখন এক আদর্শবাদী ধারণা বলে মনে হয়েছিল, যার রূপায়ণ অসম্ভব। হাজার ত্রুটি সত্ত্বেও একটা শিক্ষাব্যবস্থা পুরুষদের জন্য চালু ছিল কিন্তু সমাজের অর্ধাংশ নারীদের জন্য কিছুই ছিল না। 'এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়।' কিন্তু নারীসমাজ শিক্ষার জন্যে প্রস্তুতই নয়। শিক্ষার সঙ্গে নারীর দুর্ভাগ্য জড়িত, এরকম বিশ্বাস তাঁদের দৃঢ়। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর হাত থেকে বর্ণপরিচয় কেড়ে নেওয়ার ঘটনা আমরা সকলেই জানি। ছেলেবেলায় প্রাচীনাদের কাছে শুনেছি যে মেয়েরা লেখাপড়া করলে বিধবা হয়, আর আমার গর্ভধারিণীর হাতে ইংরেজি গ্রামার দেখে তাঁর অভিভাবক বলেছিলেন গ্রামার পড়লে ডাকাত হয়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এইটিই সমাজচিত্র। এইরকম একটা সমাজে স্ত্রীশিক্ষা চালু করা অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু ভাবজগতে ওলট-পালট করে দেওয়ার ক্ষমতা ও তার চাপরাশ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই দিয়ে গিয়েছিলেন স্বামীজীকে—তাই 'আগে মা ও তাঁর মেয়েরা, তারপরে বাপ ও তাঁর ছেলেরা' এইরকম এক অসম্ভব ভাবনা তাঁর মনে জেগেছিল। স্বামীজীর কাছে মঠ শিক্ষার পীঠস্থান—বিশ্ববিদ্যালয়। যথার্থ মানুষ তৈরির কারখানা। পাখি ওড়ে শুধু দুটি পাখাকে ভর করেই নয়, তার লেজের পালক দিকনির্ণয় ও দিক পরিবর্তনের হাল। সমাজে পুরুষ ও নারীর সমান শিক্ষার সুযোগ শুধু নয়, তার পেছনে থাকতে হবে যুগ-যুগান্ত পরীক্ষিত ঐতিহ্যের হাল। এই ঐতিহ্য সমন্বিত যুগোপযোগী শিক্ষা গড়ে তুলবে সুস্থমনা, উদার নারী-পুরুষ।

কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। পুরুষজাতির জন্যে শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হলেও নারীজাতির শিক্ষিকা পাওয়া যাবে কোথায়! স্বামীজী এই সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। একমাত্র উপায় ছিল শিক্ষিত অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে সমর্পিত পাশ্চাত্য নারী, কারণ ভারতীয় নারী তখনও প্রস্তুত নয়। পেলেন একজন প্রকৃত সিংহিনীকে যাঁর মধ্যে যোগ্য হয়ে ওঠার পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু একজন স্বাজাত্যাভিমানী ব্রিটিশ নারীর পক্ষে তার উচ্চ সংস্কারের অভিমান বিসর্জন দিয়ে অযৌক্তিক সংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতীয় নারীদের একজন হয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল। তবু অসম্ভবকে সম্ভব করাই ছিল স্বামীজীর কাজ। মিস মার্গারেট নোবল থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে নিবেদিতপ্রাণ নিবেদিতা হয়ে ওঠা স্বামীজী ও মিস নোবলের পারস্পরিক কৃতিত্ব। 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা।' এই অসম্ভাব্যতা

হিন্দু অন্তঃপুরবাসিনীদের নিয়েও ছিল। একজন ম্লেচ্ছ মহিলা, তিনি যতই কেন না তাঁদের কল্যাণকামী হোন, তাঁকে আপনার করে নেওয়া, তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করা, নিজেদের শিশুকন্যাকে পাঠানো এত সহজ ছিল না। তবে নারীদের দৃঢ় রক্ষণশীলতা সবটাই নিরর্থক ছিল না। বরং যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার নামে সমাজের সব সংস্কৃতি ভেসে যাওয়ার উপক্রম তখন নারীসমাজের এই রক্ষণশীলতাই তাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণ জুগিয়েছিল। নিবেদিতা তাদের প্রতিটি আচরণের পেছনে বৈদান্তিক সত্যের ছায়া খুঁজে পেতেন। আর পেতেন বলেই পুরনারীদের ছুঁৎমার্গের শত অপমান অম্লানবদনে সহ্য করতেন তাদেরই কল্যাণের জন্য।

নিবেদিতার কাছে শিক্ষার দুটি শর্ত ছিল। প্রথমটি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও দ্বিতীয়টি আত্মশক্তির জাগরণ। এ-জাতীয়তা রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমায় বদ্ধ জাতীয়তা নয়। এ হল বৈদিক ঋষিকণ্ঠে বিশ্ববাসীকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বানের জাতীয়তা। ''কেউ পর নয় মা, জগত তোমার''—এই বোধের জাতীয়তা। আর যে-আত্মশক্তিতে 'জগতকে আপনার করে নিতে' শেখা যায় সেই শক্তির জাগরণ। শিক্ষা মানে বাইরে থেকে জ্ঞান ও শক্তি আহরণ করা নয়, অন্তরের শক্তিকে পূর্ণ বিকশিত করে তোলার সাধনা। নিবেদিতা জানিয়েছেন—''ভারতবর্ষের শিক্ষার ভিত্তি—ত্যাগ ও প্রেম। আত্মত্যাগেই প্রেমের জন্ম, আবার প্রেমেই ত্যাগের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি। 'ত্যাগ' মানে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া নয়, অক্ষয় ধনে ধনী হওয়ার পথই ত্যাগ। ত্যাগ মানে সংসারের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া নয়, বরং জগৎ-সমাজে বিজয়ী হওয়ার একমাত্র উপায়ই আত্মত্যাগ।'' হিন্দু পরিবারকে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। গৃহকর্ত্রীর নিজের দিকে তাকানোর সময় নেই। পরিবারের সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের পর শরীররক্ষার্থে নিজের সামান্য সেবা। এমনকী অসুস্থতা যতক্ষণ না তাকে শয্যাশায়ী করে তুলছে ততক্ষণ তার বিশ্রাম নেই। শুধু তফাত এই যে, এসবই ঘটছে অজ্ঞাতে, হয়তো নারীর নিয়তি বলে মেনে নিয়ে। এর অন্তর্নিহিত ভাবটিকে জাগিয়ে তোলা, এর পেছনে যে অতি উচ্চ আদর্শের বেগটি আছে সে-সম্বন্ধে অবহিত করে তোলাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

একজন বিদেশিনীর পক্ষে এই অসম্ভব পথকে মসৃণ করে তুলেছিলেন শ্রীশ্রীমা স্বয়ং। প্রতিবেশিনী যখন স্পর্শ করা দূরে থাক তাঁর দাঁড়ানো স্থানে গঙ্গাজল ও গোবর লেপছে সেই সময়ে শ্রীশ্রীমা তাঁকে আদর করে ডেকে বসাচ্ছেন ও চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খাচ্ছেন। একসঙ্গে বসে প্রসাদ গ্রহণ করে তাঁকে অলক্ষ্যে হিন্দুসমাজে বরণ করে নিচ্ছেন। নিবেদিতার শুদ্ধমনে মাকে দেখেই মনে হয়েছিল যে ইনি বিশ্বের মহত্তমা নারী। সন্ন্যাসকামী নিবেদিতাকে স্বামীজী সন্ন্যাস দেননি, হয়তো বিদেশিনী সন্ন্যাসিনীকে হিন্দু নারীসমাজের পক্ষে আপন করে নেওয়া কঠিনতর হবে এই ভাবনায়।

এল ১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর। শ্রীমা এলেন ১৬ নং বাগবাজারের ছোট বাড়িটিতে নিবেদিতার স্কুলের শুভারম্ভ করতে। নিজের হাতে শ্রীরামকৃষ্ণের পুজো করে স্কুলপ্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করলেন। সবশেষে শক্তিময় আশীর্বাদ করলেন—''আমি আশীর্বাদ করছি যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে গড়ে ওঠে।'' নিবেদিতা উৎফুল্ল হয়ে লিখলেন—''ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির জন্য শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদের চেয়ে আর কোনও শুভলক্ষণ আমি কল্পনা করতে পারি না।''

সরলাবালা সরকার সেই প্রথম যুগেই নিবেদিতার স্কুল সম্বন্ধে লিখেছেন—''সাধারণ বিদ্যালয় বলতে যা বোঝায় এই বিদ্যালয়টি সেই

ধরনের ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মচারিণীদের জন্যে যে মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেছিলেন, সেই সংকল্পকে ভিত্তি করেই নিবেদিতা এই বিদ্যালয়ের স্থাপনা করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের কাজেই তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন আর এই বিদ্যালয়ের কাজেই নিজের জীবনদান করে গেছেন।...

''বোসপাড়া একটি ছোট্ট গলি, তার ভেতরে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়, আর সেখানে নিবেদিতার মত একজন অসাধারণ প্রতিভাশালিনী একান্ত নিষ্ঠাব্রতী নারী—যাঁর পক্ষে পৃথিবীর যে কোনও কাজে সফল হওয়া অসম্ভব ছিল না, তিনি যে সমস্ত জীবন ওই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের জন্যে দান করে গেছেন এ কথা শুনলেই আশ্চর্য্য হতে হয়।''

অনেকে আবার এই সামান্য কাজে তাঁর অসামান্য প্রতিভার নিতান্ত অপচয় হচ্ছে বলে মনে করতেন। কিন্তু তখন কে-ই বা বুঝবে যে এটি ভবিষ্যৎ মহীরুহের বীজ! কিছুদিন পরেই ভর্তি হয়েছিল পারুল বলে ছোট একটি মেয়ে, যে-মেয়েটি স্বামীজীর সংকল্পিত স্ত্রীমঠের কর্ণধার হয়ে আজকের সারদা মঠের ভিত্তি দৃঢ় করে গেছেন।

ভারতে আসার অনেক আগে থেকেই নিবেদিতার শিশুশিক্ষা সম্পর্কে পড়াশোনা ও ভাবনা-চিন্তা ছিল। ছোটদের কল্পনাশক্তি লাগাম-ছাড়া, আবার যা শেখানো হয় তার প্রতি বিশ্বাস অটুট। নিবেদিতা জানতেন যে এই কোমল প্রাণে কোনও সৎ ছবি এঁকে দিতে পারলে তার স্থায়িত্ব হয় আজীবন। তাঁর পড়ানোর ভঙ্গি ছিল খেলা, গল্প ও বর্ণনার অভিনয়ে এক প্রাণবন্ত উপস্থাপনা। পুরাণের গল্প, ভারতীয় বীরত্বের ইতিহাস, রাজপুত নারীদের বীরগাথা তাঁর বর্ণনার গুণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। শিক্ষার মূল ইতিবাচকতায়। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদানের এই ইতিবাচক ভঙ্গিটি তিনি স্বামীজীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ফলে কেউ ভুল বললেও তাকে বলতেন, আর একটু ঠিক করে বলতে হবে। কেউ ঠিক বললে অতি উৎসাহের সঙ্গে বলতেন 'ঠিক, ঠিক'। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শিক্ষার দুটি ভাগ ছিল। একটি গ্রাসাচ্ছাদনের, সংসার প্রতিপালনের উপযোগী করে, তা তাঁর ভাষায় 'চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে'। দ্বিতীয়টি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য অর্থাৎ আত্মচৈতন্য লাভ, স্বস্বরূপকে চেনা বা ঈশ্বরলাভ করার পথের সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে শেখায়। সেটিই প্রকৃত শিক্ষা। তাঁর বালক ভক্তেরা তেমন প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও এক-একজন দিকপাল, জগদাচার্য হয়ে উঠেছিলেন। যুক্তি বলে, যে-শিক্ষা আমাদের বাহ্য, আন্তর সব বাধা অতিক্রম করে মুক্ত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তাতে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয় না এ কি হতে পারে!

স্বামীজী মঠের নিয়ম-কানুন করার সময় বলেছিলেন যে, নিয়ম-কানুন মানার মধ্য দিয়েই সমস্ত নিয়ম-কানুনের পারে যেতে হবে, কারণ সেটিই পথ। তাই মুক্তি মানে চিরকালীন সামাজিক নিয়ম-কানুনকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া নয়। সমস্ত নিয়ম-কানুনের উদ্দেশ্য সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেওয়া। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু ভাবরাজ্যে বিপ্লব ঘটিয়েই ক্ষান্ত হননি, উপহার দিয়ে গেলেন রক্তমাংসের এক মুক্তমনা নারীকে, বসালেন জগতের মাঝখানে মাতৃরূপে। সেইসঙ্গে দিলেন তিনটি মুক্তিমন্ত্র—যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। অবস্থা ও পরিস্থিতি বিচার করে সিদ্ধান্ত নিয়ে পথ চলাই মুক্তির প্রথম সোপান, কারণ আত্মনির্ভরতাই মুক্তির অপর নাম। শ্রীমায়ের যাপিত জীবন সমগ্র নারীজাতির মুক্তির দিশা, তাঁর চলনে বলনে ছিল মুক্তির উদ্ভাস, তাঁর সিদ্ধান্তে, উপদেশে মুক্তির দ্বার উন্মোচিত হয়ে আছে। সে-মুক্তির সাধন, বিকাশ, পরিণতি ও আদর্শ শ্রীমা নিজেই। শ্রীরামকৃষ্ণের

কথায় 'মনেই বদ্ধ মনেই মুক্ত', তাই এ-মুক্তির সাধনে স্বেচ্ছাচার নেই, দোষারোপ নেই, অধিকার আদায়ের আন্দোলন নেই, নেই পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব, আছে কেবল শিক্ষার বলে আত্মনির্ভরতা ও আত্মশক্তি অর্জন।

স্বামীজীর কল্পনাতে সেই শিক্ষাকেন্দ্র বা মঠ কেমন হবে তার একটি রূপরেখা তিনি নিজেই দিয়েছিলেন শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে : ''গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাকবে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাকবে। আর ভক্তিমতী গেরস্তের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান করতে পাবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাকবে না।... ব্রহ্মচর্যকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে।... যোগ্যাধিকারিণী বলে বিবেচিত হলে... ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী-ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করতে পারবে।... তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে centres খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করবে।'' স্বামীজীর উপলব্ধিতে ছিল যে, সমস্ত সমস্যার সমাধানে একমাত্র শিক্ষাই মহৌষধ। তাই আরও বলেছিলেন, ''শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর নিজেরাই যা হয় করবে। বে করে সংসারী হলেও ওইরূপে শিক্ষিত মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চভাবের প্রেরণা দেবে এবং বীরপুত্রের জননী হবে।'' তাঁর আর্ষ ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল : ''এক আধ পুরুষ বাদে ওই মঠের কদর দেশের লোক বুঝতে পারবে... মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞা হন তবে তাঁর প্রতিভায় হাজারো মেয়ে জেগে উঠবে এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে।'' নিবেদিতা জানতেন, ভারতীয় নারীদের জীবনে শিক্ষার অভাব নেই, চাই তাদের আত্মবোধ ও আত্মশক্তির জাগরণ। নারীশিক্ষার মূলমন্ত্র হবে এটি, তারপর সে সংসারই করুক আর সংসার ত্যাগই করুক, তার প্রভায় সমাজ আলোকিত হয়ে উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্রোত বহুযুগ ব্যাপী বয়ে চলবে এটি স্বামীজীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। সেই স্রোতের অংশরূপে নারীমুক্তির জন্য এই যে-উদ্যোগ তার সবে একশো পঁচিশ কদম পেরিয়েছে। নিবেদিতা চেয়েছিলেন বজ্রকে ভারতীয় প্রতীকরূপে দেখতে। ভারতীয় নারীদের জন্য তাঁর নিঃশেষিত জীবনের হাড় দিয়ে তৈরি বজ্র তুলে দিয়ে গেছেন তাঁর উত্তরাধিকারীদের হাতে। সেই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের বীজ থেকে আজ জগতে প্রথম স্বাধীন সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘের উদ্ভব হয়েছে, যা সমগ্র জগতের নারীজাতির মুক্তির আলোকবর্তিকা। সঙ্ঘ স্থাপনের অর্ধশতাব্দী পার হতেই নারীচেতনায় যে-নবজাগরণের সূচনা দেখা দিয়েছে তার ফল এখনই আমাদের হতবাক করে। আজ ব্রহ্মময়ী জগজ্জননীরূপ থেকে যোদ্ধৃবেশে সজ্জিতা নারী আমাদের আর বিস্মিত করে না। এখন সমাজের সমস্ত দিকে—খেলাধূলার জগৎ থেকে শিল্প, আর্থিক সংগঠন, সুরক্ষা বাহিনী, রাজনীতি, প্রশাসন, সর্বত্র নিম্ন হতে শীর্ষ পর্যন্ত তাদের দৃঢ় উপস্থিতি। ক্ষুদ্র সংসার পরিচালনার দায় পেরিয়ে তাদের বহুমাত্রিক বিভিন্ন সংস্থার কর্ণধাররূপে পরিচালনার সাফল্যের পেছনে জগতের ভাবরাজ্যে শ্রীশ্রীমায়ের মুক্তচিন্তা ও তার রূপায়ণে নিবেদিতার ওই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টির অবদান অমূল্য, যার সামান্য অংশমাত্রই আজ সামনে এসেছে। যেকোনও স্থবির ভাবের পরিবর্তনেই একটি সাময়িক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা কাটিয়ে আদর্শানুসারী মুক্তিযাত্রা অবশ্যম্ভাবী। সে-মুক্তির পথে বাহ্য সংগ্রামের কলরব নেই, যা আছে তা নীরব অন্তঃসংগ্রাম, নিজেকে আদর্শে রূপায়িত করার সংগ্রাম, যে-সংগ্রামে জয়ী হয়ে নারী অসংকোচে বলতে পারে—

''আমি নারী আমি মহীয়সী...।''